বর্ষ ০১, সংখ্যা ০৫

দ্বিমাসিক

সোমবারে সঙ্কট

৩০ জুন, ২০২৫
১৬ আষাঢ়, ১৪৩২

বর্ণচোরা | অপারেশন তেহরান | Spice of Thriller, Thrilling Facts, Quiz

দ্বিমাসিক সোমবারে সঙ্কট

জুন সংখ্যা

প্রকাশকাল
৩০ শে জুন, ২০২৫
১৬ ই আষাঢ় , ১৪৩২

সম্পাদক
আলী রাইহান স্বপ্ন

সহ সম্পাদক
মৃন্ময় দাস

নির্বাহী সম্পাদক
অসীম রায়

সাহিত্য
ফারহানা ইয়াসমিন
সাইমুন সোহেল আবির

প্রচার ও যোগাযোগ
জেরিন রিশামনি জিম

মাল্টিমিডিয়া
কানিজ সুমাইতা প্রথা

প্রচ্ছদ
সোমবারে সঙ্কট টিম

অলঙ্করণ ও চিত্রনির্মাণ
সৌম্যজ্যোতি সরকার অর্ক

উপদেষ্টা পরিষদ
আহসান হাবিব মারুফ
আশরাফুল ইসলাম

সম্পাদকীয়

সাইকোলজি জিনিসটা কিন্তু অদ্ভুত। আমাদের চারপাশে অনেক লোক খুবই সাধারণ জীবনযাপন করছে। কিন্তু আদতে সে হতে পারে কোন সিরিয়াল কিলার! মানুষের ভিতরের আর বাইরের দুই রূপের দ্বন্দ্ব তাই বুঝা দায়! জটিল এই মানসিক জগতের গভীরে যেতে এবার আমাদের ম্যাগাজিনের থিম সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। শুরুতেই সাইকোলজি নিয়ে একটি দুর্দান্ত প্রচ্ছদ রচনা। সুধীর আর সিকদার স্যার কতদূর এগোলেন সিরিয়াল কিলিং এর তদন্তে জানতে পারবেন এ সংখ্যায়। বর্তমান ইরান ইসরাইলের যুদ্ধের সাম্প্রতিকতায় সাইকোলজির মারপ্যাঁচ নিয়ে থাকছে একটি দারুণ গল্প। অনিবার্য কারণে এ সংখ্যায় থাকছে না ধারাবাহিক গল্প "অন্য আমি"। তার বদলে থাকছে নতুন একটি ধারাবাহিক। আর তো থাকছেই সব নিয়মিত বিভাগ। সাথে আরো নতুন সংযোজন। আর এবার থেকে সোমবারে সঙ্কট হতে যাচ্ছে "দ্বিমাসিক সোমবারে সঙ্কট"!
সঙ্কটের দ্বারে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আর ম্যাগাজিন পড়ার জন্য রইলো রহস্যময় শুভকামনা।

আলী রাইহান স্বপ্ন

আলী রাইহান স্বপ্ন

দ্বিমাসিক সোমবারে সঙ্কট
বর্ষ ১, সংখ্যা ৫

ইমেইলঃ mondaycrisis0824@gmail.com
ফেসবুকঃ
https://www.facebook.com/mondaycrisis

সূচিপত্র

অচেনা মনোজগতের আঁধারে

সাইমুন সোহেল আবির

মানুষের মনের গহ্বর অনন্ত রহস্যের এক বিস্তীর্ণ সমুদ্র। তবু আমরা প্রতিনিয়ত ডুব দিই তার অজানা গভীরে, যেখানে লুকিয়ে থাকে আমাদের সবচেয়ে প্রগাঢ় ভয়, শঙ্কা আর অবচেতন মনের জটিল এক ধাঁধা। বাস্তবতা আর বিভ্রমের সীমানা যেন বারবার ঝাপসা হয়ে যায়, আর তখনই শুরু হয় এক ভয়ানক নাটক—এক ধরনের থ্রিলার, যেখানে শত্রু বাহিরে নয়, বরং আমাদের অন্তরের অন্ধকারেই বাস করে।

তোমরা যদি দেখতে চাও এই ঘরানার আসল শক্তি, তাহলে চোখ রাখো আলফ্রেড হিচককের "Psycho"-তে, যেখানে একটি সাধারণ মোটেল আর তার মালিকের দ্বৈত সত্তার ছায়া গোটা গল্পকে ঘিরে ফেলে। অথবা "Shutter Island"-এ, যেখানে একজন গোয়েন্দার অনুসন্ধান ক্রমেই তাকে নিজের মানসিক জগতে বন্দি করে তোলে।

আবার ডেভিড ফিঞ্চারের "Fight Club"-এ দুটি সত্তার সংঘাত আমাদের দেখায় আত্মপরিচয়ের সংকট কেমন করে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। "Black Swan"-এ এক নৃত্যশিল্পীর নিখুঁত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে তার মানসিক বিপর্যয়ের রূপ নেয়, যেখানে কল্পনা ও বাস্তবতা একাকার হয়ে যায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই ঘরানার ব্যাপ্তি বিশাল। ফিওদর দস্তয়েভস্কির "Crime and Punishment"-এ রাসকলনিকভের অপরাধবোধ ও আত্মসংঘাতের মানসিক যাত্রা আজও আমাদের মন স্পর্শ করে। শার্লট পারকিন্স গিলম্যানের "The Yellow Wallpaper"-এ এক নারীর ভাঙন আমাদের শেখায়, মন ভেঙে পড়লে কী ভয়ানক পরিণতি হতে পারে। গিলিয়ান ফ্লিনের "Gone Girl"-এ মনস্তাত্ত্বিক প্রতারণা ও দ্বৈততা গল্পের গভীরে গিয়ে জড়িয়ে ধরে পাঠককে।

তোমরা যদি আরও খোঁজ নিতে চাও, তাহলে "Se7en", "Prisoners", "The Machinist", "Memento", "Donnie Darko"-র মতো চলচ্চিত্রগুলোর দিকে তাকাও, যেখানে চরিত্রদের মানসিক অস্থিরতা, স্মৃতিভ্রষ্টতা, কিংবা অপরাধবোধ তাদের নিজস্ব অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

সাহিত্যে "Rebecca" ও "The Girl on the Train"-এও এমন অস্থিরতা পাওয়া যায়, যেখানে পাঠক নিজের বাস্তবতা নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়ে।

এই সংখ্যার গল্পগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবে—এমন কিছু চরিত্র, যারা অপরাধবোধ, আত্মসন্দেহ, এবং স্বপ্ন-বাস্তবের দোলাচলে হারিয়ে গিয়ে নিজের সত্তাকেই ভুলে যেতে বসে।

এই গল্পগুলোতে প্রশ্ন ওঠে—আসল ভয়টা কোথায়? বাইরের জগতে, নাকি আমাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অজানা এক সত্তায়? কখনো কি আমরা নিজের ভেতরের অন্ধকারের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত?

এবারের সংখ্যা শুধুই গল্প নয়, বরং এক মানসিক অভিযাত্রা। পাঠকের মনে প্রশ্ন ছুড়ে দেবে—আমি কী সত্যিই নিজের মনকে জানি? আমি যাকে বিশ্বাস করি, সে কি আমি? নাকি অন্য কেউ?

মনের অন্ধকার থেকে মুক্তির পথে এই অবসাদী যাত্রার রহস্যের অতলে তাহলে ডুব দেয়া যাক।

বর্ণচোরা

মৃন্ময় দাস

(৩য় পর্ব)

অন্যদিকে, সিকদার স্যার গাড়ি ছুটিয়ে গেছেন মতি মঞ্জিলে। গ্রীন লেন রোডের ব্লক ডি-র প্রথম বাসাতেই থাকতেন মো: আরমান। জজ কোর্টের নাম করা বিচারক এবং রহমত শেখের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে।

বাসার কলিং বেল চাপতেই কেয়ার টেকার শিমুল দরজা খুলে দিলো। ভিতরে গিয়ে স্যার সোফায় বসলেন আর ঘরের চারদিকটা দেখে নিলেন। বিচারক হিসেবে যতটুকু যাকজমক বাসা হওয়ার কথা তার থেকে ঢের বেশি। তার মধ্যে ছেলেকে কানাডায় পড়িয়েছেন নিজ খরচে। শিমুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা গেল ডা: দত্তের মতোন আরমান সাহেবও একাই থাকতেন। ছেলে বিদেশেই থাকে। মৃত্যুর পরেও আসতে পারেনি, এক মাস পর এসে দেখে গেছে সব, এরপর নাকি আবার মাস ছয়েক পর এসে সব বেঁচে টেচে চলে যবে একবারে।

আগেই বলেছি সিকদার স্যার একা একবার স্পট দেখতে পছন্দ করেন। তাই শিমুলকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে রেখে গোটা বাড়িটা ভালো করে চক্কর মেরে নিলেন আগে। ফিরে এসে সোফায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শিমুলের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"এবারে প্রথম থেকে শেষ অবধি সবকিছু বলো শুনি। কিছু যাতে বাদ না যায়।"

- সেদিন স্যার ঘুম থেকে উঠেছিলেন বরাবরের মতোই সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ। এরপর ফ্রেশ হয়ে কফি খেয়ে হাঁটতে গেলেন। হেঁটে এসে চলে গেলেন ছাদে। ওখানেই উনি প্রতিদিন এক ঘন্টা শরীর চর্চা করতেন। সেদিনকেও আমাকে কমলার রস উপরে পাঠিয়ে দিতে বলে ছাদে চলে গেলেন। সাড়ে আটটা নাগাদ আমি গিয়ে ছাদের টেবিলে গ্লাস রেখে চলে আসি। এরপর সাড়ে নয়টা নাগাদ আবার ছাদে যাই স্যারকে ডাকতে, কারণ স্যারের ছাত্র এসেছিল স্যারের সাথে দেখা করতে আর স্যার সাধারণত সোয়া নয়টার মধ্যেই নেমে আসেন...

- আর কাউকে দেখতে পাওনি ওই সময়?
- না স্যার, আমি তো ভিতরের ঘরে ছিলাম। স্যারকে জুসটা দিয়েই আমি রান্নাঘরে চলে যাই, পরে কলিং বেলের শব্দ পেয়ে দরজা খুলে আবির বাবুকে মানে স্যারের ছাত্রকে বসতে বলি। আধ ঘন্টা হয়ে যাওয়ার পরেও যখন স্যার নামতেছিলেন না তখন গিয়ে দেখি স্যার ইয়োগা ম্যাটে পড়ে আছে আর জুসের গ্লাসটা পাশে উল্টে আছে।

- এরপর কি হলো?
- এরপর আমার আওয়াজ শুনে স্যারের ছাত্র ছাদে আসে আর পুলিশকে ফোন দেয় তারপর তো পুলিশ চলে আসে আধ ঘন্টার মধ্যেই।
- ভালো করে মনে করে দেখো সেদিন সকালে আর কিছু ঘটেনি তো?
- ও হ্যা স্যার, পুলিশ এসে যখন গেটের সিসিটিভি চেক করে তখন দেখতে পায় একটা লাল টি শার্ট পড়া লোক মাথা থেকে সাদা ক্যাপ খুলে নাড়াতে নাড়াতে বাইরের গেট খুলে বেড়িয়ে যায় আর এটা ঘটে আবির বাবু আসার পরে।
- তোমার এই আবির বাবুর নাম্বার টা দেও তো।
- একটু বসুন স্যার, স্যারের ফোন ডাইরিতে নাম্বার থাকার কথা। (কিছুক্ষণ পর) এই নিন স্যার, এটা হলো আবির বাবুর নাম্বার।

সিকদার স্যার আবিরের নাম্বার নিয়ে বের হয়ে আসেন বাসা থেকে। এরপর বাইরের গেটে দাঁড়িয়ে আবিরকে কল করেন আর বাসার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখেন। বাসার উত্তর পাশ দিয়ে একটা লোহার পাইপ ছাদে উঠে গেছে দেখতে পান।
আবিরের সাথে কথা বলে ওকে নবাব বাজারে আসতে বলেন এবং গাড়িতে গিয়ে বসেন। তখন গাড়ির রেয়ার মিররে শেষ বিকেলের রোদে একটা ছায়া মূর্তি দেখতে পান।

গাড়ি চলে আসলো নবাব বাজারে ফটিকের দোকানের বিপরীতে। ড্রাইভার আমিন চা নিয়ে আসলো স্যারের জন্য। চা শেষ করতেই আবিরের কল আসলো স্যারের ফোনে। স্যার কল ধরে ফটিকের দোকানের সামনে ডাকলেন আবিরকে। আবির আসলে ওকে নিয়ে ভিতরে বসলেন স্যার।
- সেদিন কেনো গেছিলে আরমান সাহেবের বাসায় ?
- স্যার, আমি স্যারের কাছে ইন্টার্ন হিসেবে জয়েন করেছিলাম ঘটনার মাস দুয়েক আগে। আর সেদিন স্যার আমাকে ডেকেছিলেন একটা নতুন কেসের ব্যাপারে কথা বলার জন্য।
- সেদিন আরমান সাহেবের বাসার কাছে কাউকে দেখেছিলে?
- হ্যা স্যার, আপনার কথায় মনে পড়ল। একটা অদ্ভুত লোকের সাথে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা লাগে বললে ভুল হবে। পিছনে থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ছিল ধাক্কাটা। এবং এমনই যে, আমার হাতে থাকা ফাইলটা মাটিতে পড়ে যায় কিন্তু সে পিছনে ঘুরে পর্যন্ত তাকায় না।
- তারপর?
- তারপর আর কি স্যার, কালো রঙের হুডি পড়া লোকটা স্যারের বাসার গলির বাঁকে হারিয়ে যায় আমি ফাইল ঠিক করতে করতে।
- ঠিকাছে বুঝতে পারছি। তোমাকে পরে দরকার হলে থানায় আসতে হবে কিন্তু। ফোন পেলে চলে এসো। আর নতুন কোনো সৎ বিচারকের কাছে ইন্টার্ন এর চেষ্টা করো। সাবধানে থেকো।
কথা শেষ করে আবিরের দিকে একটা চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে স্যার বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে। এসে ফোন বের করে হাতে নিতেই সুধিরের কল ভেসে উঠলো। কল ধরতেই ওপাশ থেকে,"স্যার রতন দা'র দোকানে চলে আসুন, জরুরী কথা আছে।" স্যার ফোন রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রতন দা'র চায়ের ঠেকে বসে প্রথম চুমুক দিতেই সুধির এসে পাশে বসলো। দাদাকে বললাম আরেকটা চা দিতে। সাথে সাথে সুধির বলে উঠলো একটা না দুটো দাও।
- আমি বললাম কিরে দুটো কেনো?
- সিকদার স্যার আসছেন। আমিই কল দিয়েছিলাম আপনাকে কল দেওয়ার পর।

এরপর ও চেয়ারে বসতেই দু কাপ ধোঁয়া ওঠা চা চলে এলো টেবিলে। আমি আমার কাপে আরেক চুমুক দিতেই সিকদার স্যার চলে এলেন। আমরা উঠে দাঁড়াতেই বলে উঠলেন," কিরে আমি আসার আগেই শুরু করে দিয়েছিস?"
- এই তো স্যার এখনই দিয়ে গেলো। বসুন।
এই সুধির, এখন শুরু কর তাহলে কেন ডাকলি হঠাৎ।
- স্যার একটা বড় লিঙ্ক পেয়েছি কেসের ব্যাপারে। দুপুরে ফোনে রহমতের কথা তো বলেছিই আপনাকে।
- হ্যা, সেসব তো হয়েছে। আর যারা খুন হচ্ছে এরাও তো সব তার কাছের লোক। তাহলে নতুন কি পেলি।
- ওটা বলতেই তো আপনাদের এখানে ডাকা। ওদের সব ক'টাকে নিয়ে আরেকবার দেখতেই খেয়াল করলাম গতবছরের একটা রেপ কেসে এই প্রত্যেকের নাম পত্রিকায় এসেছিল একবার। পরে আমার খবরিকে ফোন দিতেই আসল কথা জানতে পারলাম।
- এই রেপ কেসের কি রায় বের হয়েছিল?
- স্যার সেটাই তো আসল কথা, এই মামলাটা ট্রায়ালেই বাতিল হয়ে গেছিল। বলছি স্যার পুরোটা, শুনুন।

ঘটনাটা গতবছর জুন মাসের শেষ দিকের। পেপারের ভিতরের পাতায় শুধু শিরোনাম ছিল "কিশোরীর রেপ? মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত রবিন শেখ?" (এটা বলে সুধির সিকদার স্যারের দিকে পেপার কাটিং টা এগিয়ে দিলো)। এটা দেখেই আমি আমার খবরিকে কল দেই। তার কাছ থেকে জানতে পারি, আকাশী নামের এক কিশোরীর রেপ করে রহমতের ছেলে রবিন, সাথে ছিল ওর বন্ধু রাহুল। যখন মামলা করা হয় কোর্টে তখন তদন্তের ভার পড়ে এসআই মাকরামের উপর...

সুধিরের কথা শেষ না হতেই সিকদার স্যারের ফোন বেজে ওঠে। বাংলামোটর থানার টেলিফোন থেকে কল এসেছে। কল ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে,"স্যার, এসআই মাকরাম খুন হয়েছেন থানার সামনেই।"

(চলবে)

THRILLING FACTS

ভবিষ্যতের চোখ খুলে যাচ্ছে!

চিলির আন্দিজ পর্বতের কোলে দাঁড়িয়ে, প্রায় দুই দশকের গবেষণায় তৈরি হয়েছে এক অসাধারণ মহাজাগতিক দৃষ্টি—বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল ক্যামেরা, ভেরা সি. রুবিন অবজারভেটরি।

৩২০০ মেগাপিক্সেলের এই দৈত্যাকার চোখ প্রথমবারের মতো মহাকাশের দিকে তাকাতে যাচ্ছে ২৩ জুন, বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়। ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার হবে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত—আপনি হতে পারেন এর সাক্ষী!

এটা কোনো সাধারণ ক্যামেরা নয়। প্রতিদিন স্ক্যান করবে দক্ষিণ আকাশ—২০ টেরাবাইট তথ্য সংগ্রহ করে গড়ে তুলবে ৬০ পেটাবাইটের এক মহাজাগতিক মহাসাগর।

এর ফোকাল প্লেন এতটাই বিশাল যে, একসাথে ৪০টি পূর্ণিমার চাঁদ জায়গা পাবে এক ফ্রেমে! আর রেজুলেশন? এমন উন্নত যে ১৫ মাইল দূর থেকে একটি গলফ বলও দেখা সম্ভব! রুবিন অবজারভেটরির সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ক্ষমতা? এটি দেখতে পাবে মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন—রিয়েল টাইমে। অদৃশ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (UV, Optical, Near-IR) আকাশ স্ক্যান করে গড়ে তুলবে এক টাইমল্যাপস ইউনিভার্স—যেটা আগে কেউ কখনো দেখেনি।

প্রতিটি আকাশপটে ফিরবে বারবার—প্রায় ৮০০ বার! প্রতিটি পরিবর্তন, প্রতিটি আলোড়ন ধরা পড়বে তার চোখে।

এই এক যুগের প্রকল্প বদলে দিতে পারে আমাদের মহাবিশ্ব-চিন্তা। প্রস্তুত তো? ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর সময় এসে গেছে।

Source: BIGAANNESHI

অপারেশন তেহরান

আলী রাইহান স্বপ্ন

স্ক্রিনের মধ্যে দেখাচ্ছ আর ৪০% হলে সম্পূর্ণ ডাউনলোড। কপালে ঘাম ঝরছে কামালের। চারপাশ সতর্ক চোখে দেখছে সে। বড় বিপজ্জনক কাজ করতে চলেছে সে। ১০০%! ঝটপট পেনড্রাইভটা সার্ভার থেকে খুলে নিয়ে গোপন পকেটে রেখে রেভেরুল্যাশনারী গার্ডস হেডকোয়ার্টারস এর সার্ভার রুম থেকে বের হলো কামাল। আশেপাশের সিসিটিভির ক্যামেরার সামনে সাধারণ হয়ে করিডোর পার হয়ে লিফটের কাছে পৌঁছালো। Ground floor চাপ দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস। আর একটু। তারপর সে নিশ্চিন্তে বর্ডার পার হবে। ইরানের সীমান্তের বাইরে। তার মিশন সফল হবে। Ground floor থেকে exit এর দিকে যাইতে ওর শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা শিহরণ খেলে গেল! এ যেন এক দুঃস্বপ্ন!

মিস্টার কামাল। গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে আপনাকে গ্রেফতার করা হলো। Covert operation এ থাকা মোসাদের দুর্ধর্ষ এক এজেন্ট গ্রেফতার! পুরো তেহরান জুরে হইচই!

পালানোর চেষ্টা করে আহত হয়ে হাসপাতাল চিকিৎসায় কামাল ওরফে নেতিনিয়া বাইজান। বাইরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা। ভিতরে নেতিনিয়ার মনে চলছে পালানোর পরিকল্পনা। মোসাদের দুর্ধর্ষ এজেন্ট সে। গ্রেপ্তার হয়ে বন্দি থাকা তার সম্মানে দাগের মতো। তাকে যে করেই হোক পালাতে হবে। সকালের নাস্তার সাথে একটা লুকানো কাগজ! ইয়েস। মোসাদ তাকে বের করার চেষ্টা করছে। কোডটি দেখে সে বুঝতে পারলো তার কমান্ডার ডেভিডও আছে। তার কাছে তথ্য চাচ্ছে। Morse code এ সে লিখে পাঠালো সে সব তথ্য। তার চোখ এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় ঝলমল করে ওঠে। নাস্তার থালার মধ্যে গোপনে কোড পাঠানোর পরপরই সে তার গলায় সুঁই এর মতো কি যেন ফুটলো অনুভব করলো। তারপরই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে।

জানলার কাঁচ দিয়ে এতক্ষণ সবকিছু দেখছিলো ইরানের স্পাই এজেন্সির কয়েকজন।
আহাদ, খুব ভালো পরিকল্পনা করেছো তুমি। মোসাদের এজেন্ট, টর্চার করলেও তার থেকে খবর বের করা যায় না তার থেকে নিমিষেই এতগুলো তথ্য বের করে ফেললে।
আসলেই আহাদ সাইকোলজির মাস্টারমাইন্ড। কিন্তু এর কি হবে? এরকম ভাবে ইনজেকশন আর ম্যানিপুলেশন ওকে মানসিকভাবে শেষ করে দিবে না?
দিলে দিক। আমাদের দরকার তথ্য। এতে ও মরলেও কি যায় আসে। আহাদ বললো।

চলো এখন যাওয়া যাক। তথ্যগুলো decode করি। বলে ৩ জনে হাঁটা দিল। আহাদ সবার পিছনে। আরেকবার সে দেখে নিল হাই ডোজের ঔষধে ঘুমে তলিয়ে থাকা ওকে। আহাদের ফোনে নিঃশব্দভাবে আসে এক নোটিফিকেশন তখনই।নিঃশব্দ এক নোটিফিকেশন। মোসাদ প্রধানের! সাইকোলজি এক বড় জটিল ধাঁধার খেলা!

অস্তিমা মেঘ

আদিবা ইবনাত মিম

সুব্রত নতুন জীবন শুরু করতে একাকী চলে এসেছিল গ্রামান্তরের এক পুরনো বাড়িতে। বাড়ির চারপাশে নীরবতা, আর রাতে যেন বাতাস থমকে যায়।

প্রথম রাতেই সে অনুভব করল, কেউ তাকে দেখছে—কোনো অদৃশ্য চোখ, যা ছায়ার মতো ঘিরে ধরে। একসময় সে শুনল, ভেঙে যাওয়া আলমারির ভিতর থেকে একটা ডায়েরির পাতাগুলো কুঁচকে উঠছে। পাতাগুলোতে লেখা ছিল এক মন্ত্র, আর এক অদ্ভুত নাম—'মেঘ'।

গ্রামের পুরনো লোকেরা বলেছিল, ওই বাড়ির শেষ মালিক মেঘ নামের একজন ছিল, যার আত্মা বেঁচে নেই, কিন্তু ছায়ার মতো ভাসে। সে বেঁচে থাকার জন্য কাউকে তার মুক্তি দিতে চায়।

সুব্রত মন্ত্রের সাহায্যে মেঘকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। রাতের নিস্তব্ধতায় মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে গলে যেতে শুরু করল। কিন্তু ততক্ষণে মেঘ তার অস্তিত্বে সুব্রতকে মিশিয়ে ফেলেছিল।

পরদিন সকাল, কেউ বাড়িতে ছিল না—সুব্রত অদৃশ্য। শুধু ছড়িয়ে ছিল ডায়েরির শেষ পাতা, যেখানে লেখা ছিল—

"মুক্তি হলো বন্ধন, আমি আর তুমি—অস্তিমা মেঘ। যেকোনো সময় ছড়িয়ে যাবো আকাশে, অন্ধকারে।"

গ্রামের মানুষ আজও রাতে ওই বাড়ির দিকে তাকায়। কেউ বলে, মেঘ আর সুব্রত মিলে এখনও ভাসে অন্ধকারে,
অদৃশ্য, অমোঘ, চিরকাল অস্তিমা মেঘ।

SPICE OF THRILLER

পড়ন্ত বিকেল। তেহরান এর গিশাহ রেসিডেন্সিয়াল এলাকার একটি ফ্ল্যাট। বাসিন্দা হলেন ইরানের একজন উচ্চপদস্থ পরমাণু বিজ্ঞানী। মুহূর্তের মধ্যে ঐ ফ্ল্যাটে ছোট্ট এক বিস্ফোরণের শব্দ আর মারা যায় ঐ উচ্চপদস্থ পরমাণু বিজ্ঞানী! এই ঘটনার রচয়িতা হলো ইসরাইল! কিন্তু তারা কীভাবে করলো এই মিশন। অন্য কোন ব্যক্তি বা ফ্লাটের ক্ষতি না করে শুধু লক্ষ্যে থাকা ব্যক্তিকে হত্যার জন্য তারা ব্যবহার করছে Harop Drone technology। আত্মঘাতী এই drone লক্ষ্যবস্তুর এলাকার মধ্যে ঘুরতে থাকে লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায়। ঠিক সময়ে লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে নির্ভুল আঘাত আনে ক্ষুদ্র, নিশ্চুপ এই drone। Israel Aerospace Industries এর তৈরি মানুষ বিহীন, ১০০০ কি.মি পরিসর পর্যন্ত নিখুঁত হামলা করতে সক্ষম এই drone বর্তমান সময়ের এক আতঙ্ক!

বিখ্যাত লেখকদের গল্প

জেরুজালেম-এর একটি গল্প

এডগার এলান পো

শহর ঘিরে বসে শত্রুপক্ষ। তারা রয়েছে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপর। সেখান থেকে অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর আর দুর্গ। নিচের এই দুর্গ-শহর থেকেই এখুনি ভেট আসবে। নধর ভেড়া। বলি দেওয়ার পর ভেড়ার মাংসে পেটপুজো করবে শত্রুসৈন্য। এরা সবাই ছিন্নমুষ্ক। নিচের শহরদুর্গের মানুষরা তা নয়-তাই তারা বিধর্মী। পাহাড়ের ডগায় বসে দন্তে ফেটে পড়ছে ছিন্নমুষ্ক সেনাপতি- "আমাদের উদারতা লোককে বলে বেড়ানোর মতন। অবরোধ করে বসে আছি শুধু খুঁচিয়ে মারবার জন্যে। তা না করে টাকা চাইলেও পারতাম। কিন্তু কি চাইছি আমরা? নধর ভেড়া-বলির জন্যে-আহারের জন্য।"!

ওপর থেকে দড়িতে বেঁধে বাক্স ঝুলিয়ে দেওয়া হলো নিচে। ভারি জিনিস চাপানো হলো নিচে তাই টান-টান হয়ে গেল দড়ি। অনেক জনে মিলে টেনে তুলল বাক্স।

হেঁট হয়ে প্রথমে যারা দেখেছিল বাক্সের চতুষ্পদ জীবটাকে- সোল্লাসে বসেছিল তারা-"খাসা ভেড়া। বাজাও তুরীভেড়ি, গলা ছেড়ে গাও গান-প্রাণ হোক আটখান!”

বাক্স ওপরে উঠে আসার মুখ শুকিয়ে গেল প্রত্যেকেরই। বাক্স থেকে তেড়ে বেরিয়ে এল যে চতুষ্পদ জীবটি, দূর থেকে যাকে উত্তম ভেড়া বলে মনে হয়েছিল-আসলে সে একটি অতিকায় ছিন্নমুষ্ক শূকর।

যার মাংস অতি পবিত্র-আহারের নামও উচ্চারণ করতে নেই।

শেষ চিঠির ছায়া

আশরাফুল ইসলাম

(১ম পর্ব)

নীলয় আহমেদ, বয়স ২৮, একজন তরুণ লেখক। তার জীবনের লক্ষ্য ছিল এমন একটা উপন্যাস লেখা, যা মানুষের মনে দাগ কাটবে—যেমনটা শরৎচন্দ্র বা বিভূতিভূষণ পেরেছিলেন। কিন্তু শহরের কোলাহলে বসে কিছুতেই সে শান্তি পাচ্ছিল না। লেখার প্রতিটি বাক্য যেন কাঁচা থেকে যাচ্ছিল।
ঠিক তখনই তার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের ফোন আসে— পুরান ঢাকায় তাদের এক পুরনো বাড়ি আছে, "আবেদ মঞ্জিল"। এখন আর কেউ থাকে না সেখানে। যদি নীলয় কিছুদিন থাকতে চায়, তাহলে সে থাকতে পারে বিনামূল্যে।
নীলয় দ্বিধা করেনি। কিছু দিনের নিঃসঙ্গ পরিবেশে থাকা, পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে দেখা—লেখার জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু হতেই পারে না।

বাড়িটি ছিল ভাঙাচোরা, তবে স্থাপত্য ছিল চোখ ধাঁধানো। বিশাল কাঠের দরজা, ঝুলন্ত লোহার বারান্দা, আর প্রতিটি ঘরে প্রাচীন চিত্রকলা।
প্রথম দিনেই সে অনুভব করল কিছু একটা অদ্ভুত জিনিস। দেয়ালে লাগানো একটা আয়নার সামনে দাঁড়াতেই তার চোখ আটকে গেল। আয়নায় তার পেছনে কিছু একটা নড়ছে—কিন্তু ফিরে তাকালে কিছুই নেই।
নীলয় ভাবল, হয়তো ক্লান্তি, হয়তো কল্পনা।
রাতে সে ডায়েরিতে লিখল—
"বাড়িটি অদ্ভুত। যেন দেয়ালগুলো চোখে চোখ রেখে কথা বলে। আজ আয়নায় ছায়া দেখেছিলাম, কিন্তু বাস্তবে কিছুই ছিল না। কল্পনা হয়তো। কিন্তু এক অদ্ভুত অনুভূতি—এই বাড়ির দেয়ালে কিছু চাপা পড়ে আছে। আমি খুঁজে বের করব।"
পরদিন সকালে নীলয়ের ঘুম ভাঙলো একটা অদ্ভুত আওয়াজে। যেন দূরে কোথাও ধাতব কিছু পড়ে ভেঙে গেল। কিন্তু পুরো বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। সে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে, পুরোনো কাঠের সিঁড়ি থেকে শব্দ হয় – ঠক... ঠক... ঠক।
নিচতলায় আসার পর সে একটি হলঘর দেখতে পায়। হলঘরের মাঝ বরাবর একটা পুরনো আয়না। আয়নাটির সামনে দাঁড়াতেই আবার সেই ছায়ামূর্তি। এবার আরও স্পষ্ট। যেন একজন নারী দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে—লম্বা চুল, পাতলা ওড়না, কিন্তু মুখটা অস্পষ্ট।
নীলয় পিছনে ফিরে তাকায় — কেউ নেই।
হঠাৎ সে অনুভব করে, আয়নার গায়ে যেন কিছু আঁকা আছে — খুবই ক্ষীণ, প্রাচীন হাতে লেখা অক্ষর। সে একটি মোবাইল টর্চ জ্বালিয়ে আয়নাটি ভালোভাবে দেখে। আয়নার নিচের কোণায় খুব ম্লান করে লেখা —
"কঙ্কাবতী"
এক মুহূর্তের জন্য নীলয়ের গা শিউরে ওঠে।
"কঙ্কাবতী? এই নাম কোথায় যেন শুনেছি..."
সে বাড়ির ঘরগুলো খুঁজে দেখতে থাকে। অবশেষে একটি পুরনো কাঠের আলমারিতে ধুলো-মলিন একটা খাতা পায়। ভেতরে কিছু কাগজ, ছবি, আর একটা চিঠি রাখা।

চিঠির প্রথম লাইন:
"যদি কেউ এই চিঠি পড়ে, জেনে রেখো — আমার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।"
চিঠিটা খুব পুরনো। কালি অনেকটা মুছে গেছে, কিছু শব্দ বোঝা যায় না। কিন্তু নীলয় বুঝতে পারে — এখানে একটা অমীমাংসিত মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে।

চিঠির আংশিক লেখা:
"...আমার নাম কঙ্কাবতী। এই ঘরে আমার প্রাণ কেঁদেছিল, ভালোবেসেছিল, আর... ভেঙে গিয়েছিল। সবাই বলে আমি আত্মহত্যা করেছি।
কিন্তু আমি বলি — আমি খুন হয়েছিলাম।
খুনি আমার খুব কাছের কেউ। কেউ বিশ্বাস করবে না...
যদি কেউ সত্যি জানতে চাও, তাহলে খুঁজে দেখো — আমার আয়নার পেছনে গোপন থাকে সব।
শেষ চিঠি যখন পড়বে, তখন বুঝবে তুমি একা নও।
— কঙ্কাবতী"

নীলয়ের গলা শুকিয়ে আসে। কে এই কঙ্কাবতী? কেন সে বলছে তাকে খুন করা হয়েছিল? আর আয়নার পেছনে কী আছে?
সে পরদিন সকালে সিদ্ধান্ত নেয় — সে আয়নাটি খুলবে।
কিন্তু সেদিন রাতেই আবার ছায়াটি তার সামনে আসে —
এইবার আয়নায় নয়, বরং তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে—
"পেছনে দেখো না... শুধু সামনে এগিয়ে চলো... নাহলে আমিও হারিয়ে যাব..."

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। নীলয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন অন্ধকার তার দিকে কিছু বলতে চাইছে।
হঠাৎ একটা ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা তাকে কাঁপিয়ে দিল।

বাড়ির ভেতরে ফিরে এসে সে আবার সেই পুরনো আয়নার সামনে দাঁড়ায়।
আয়নার নিচের কোণার সেই লেখা আবার চোখে পড়ে — "কঙ্কাবতী"।
সে হাত বাড়িয়ে আয়নার পেছনের কাঠটা ঠুকঠুক করে বাজায়। হঠাৎই একটা জায়গায় খালি আওয়াজ পেল—কিছু একটা যেন ভিতরে লুকানো। উত্তেজনায় নীলয়ের বুক ধুকপুক করে ওঠে।
সে কাছেই রাখা একটি পেন-নাইফ দিয়ে কাঠের ফ্রেমটা আলতো করে খুঁটে খুঁটে খুলতে শুরু করে। কিছু সময় পরই আয়নাটা আলগা হয়ে আসে।

আয়নার পেছনে একটা গোপন কুঠুরি! ছোট, কিন্তু স্পষ্টভাবে কারো হাতে তৈরি। ভিতরে কাপড়ে মোড়া কিছু জিনিস। সে ধীরে ধীরে খুলে দেখে —

একটি পুরনো ধাতব চাবি।
একটি সাদা-কালো বিবর্ণ ফটো — ছবিতে এক তরুণী, মুখে গভীর দৃষ্টি, চোখে যেন এক অনন্ত অভিযোগ। নিচে লেখা — "কঙ্কাবতী, ১৮৫৬"
আর একটি ভাঁজ করা কাগজ — চিঠি। কাগজটা পুরনো হলেও লেখাগুলো স্পষ্ট।

চিঠির অংশবিশেষ:
"এই ঘর আমার কারাগার।
আমি ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু তারা বলল আমি অধম। আবেদ আলী খাঁ বলেছিলেন, সমাজ আমাকে মেনে নেবে না। আমি পালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। সে রাতে আমি তাকে অপেক্ষায় রেখেছিলাম বাগানের পেছনে। কিন্তু পৌঁছাতে পারিনি — আমারই ঘরের ভেতর আমার মৃত্যুর আয়োজন চলছিল।
আমার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। যদি কেউ একদিন এই চিঠি পড়ে — তাহলে বুঝবে, সত্যকে ঢেকে রাখা যায়, কিন্তু মুছে ফেলা যায় না।"
নীলয়ের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। তার গলা শুকিয়ে আসে।
সে চিঠির শেষ দিকে নজর দেয় —
"আমি জানি, আমার কাহিনি কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কেউ যদি সত্য খোঁজে, সে অবশ্যই খুঁজে পাবে —
ছায়ার মাঝে থাকা আলো।
— কঙ্কাবতী"

নীলয় আয়নার পেছনের সেই কুঠুরি আবার দেখে। চাবিটি কোথায় ব্যবহার হবে? বাড়িতে কি আরও কোনো গোপন ঘর বা সিন্দুক আছে?

তবে তার মন জানে — আজ সে একটি দরজা খুলেছে, যা শুধু কাঠের নয়, এক শতাব্দীর চাপা ইতিহাসের।

সে জানে, রাত আরও গভীর হবে — আর ছায়া তাকে ডেকেই চলবে...

নীলয় চিঠির ভাষায় যেন এক ভগ্নপুরুষের বেদনাকে অনুভব করতে পারে। সেই রাতটি কেমন ছিল, সে ভাবতে লাগল। কীভাবে একটি হৃদয় এত নৃশংসভাবে ভেঙে ফেলা হল?
সে সিদ্ধান্ত নিল বাড়ির পুরনো নথিপত্র আর পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করবে। হয়তো সেখানে মিলবে এই রহস্যের সুত্র।
পরদিন সকালে সে বাড়ির পুরানো লাইব্রেরির খোজঁ পায়। লাইব্রেরির দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলল। ধুলো আর সময়ের গন্ধ মিশে থাকা কাগজপত্রে সে খুঁজতে লাগল 'আবেদ আলী খাঁ' নামটি।
নীলয়ের চোখে পড়ল এক বিবরণ — আবেদ আলী খাঁ ছিলেন ১৮২০ দশকে এই এলাকায় প্রভাবশালী জমিদার। সমাজের নিয়মনীতি কঠোর ছিল তখন। তার সন্তানদের জীবন পছন্দ অনুযায়ী চলা ছিল অসম্ভব।
আবেদ আলীর একমাত্র কন্যা ছিল কঙ্কাবতী, যাকে সে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসত, কিন্তু একইসঙ্গে তার জন্য কঠোর শাসকও ছিল।

(চলবে)

রহস্য সঙ্কট

খুঁজে দেখো-০১

১। সপ্তাহের কোনদিনে "হোটেল রেডরুফ" এ খুন হয়?
ক) শনিবার　　খ) সোমবার
গ) বুধবার　　ঘ) শুক্রবার

২। কার গলায় ক্যামেরার ব্যাগ ছিল?
ক) উপো　　খ) শিফু
গ) রাসেল　　ঘ) রুহি

৩। একজন সিরিয়াল নূন্যতম কত দিনের ব্যবধানে খুন করে থাকেন?
ক) ১৫　　খ) ২৫
গ) ৩৫　　ঘ) ৪৫

প্রিয়, পাঠক। এই সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের নতুন নিয়মিত বিভাগ "রহস্য সঙ্কট"। এই বিভাগে থাকছে দুই ধরনের "রহস্য কুইজ"।
এক, গত সংখ্যা থেকে খুঁজে বের করতে হবে তিনটি প্রশ্নের উত্তর, কিন্তু তা মোটেও সহজ হবে না। তাই ভালো করে প্রশ্ন আর অপশন বুঝে উত্তর করতে হবে।
দুই, একটা রহস্য গল্প দেওয়া থাকবে এবং গল্প শেষে একটা প্রশ্ন থাকবে। গল্প পড়ে মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে সঠিক উত্তর।

শর্তাবলী:

১। সকল প্রতিযোগীকে **উভয় কুইজের-ই** উত্তর পাঠাতে হবে। উত্তরদাতাদের মধ্যে বিজয়ী তিন জনের নাম প্রকাশ করা হবে পরবর্তী সংখ্যায়।
২। উত্তর পাঠানোর শেষ সময়, **২৩:৫৯ ৩১শে জুলাই ২০২৫**
৩। উত্তর পাঠানোর সময় subject -এ লিখতে হবে 'রহস্য সঙ্কট', এরপর মেইলের body অংশে বিষয় দুটোর নাম লিখে উত্তর লিখতে হবে।
৪। উত্তর শেষে নিজের নাম, বয়স, জেলা ও প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে সোমবারে সঙ্কটের মেইলে।
ইমেইলঃ mondaycrisis0824@gmail.com

নিঃশব্দ রাতঃ পর্ব ০১

হ্যালোইনের রাতে, শান্ত র‍্যাভেনসউড শহরের ধনী ব্যবসায়ী মিস্টার রোনাল্ড পার্কার তার নিজস্ব প্রাসাদসদৃশ বাড়িতে এক বিশাল মাস্ক পার্টির আয়োজন করেছিলেন।
ঘর ছিল মুখর — হাসি, গান, আর মুখোশ পরা অতিথিদের ভিড়ে।
কিন্তু রাত ১২টা ১০ মিনিটে, হঠাৎ সব থেমে যায়।

মিস্টার পার্কারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় — তার ব্যক্তিগত স্টাডি রুমে, একা, ডেস্কে হেলে পড়ে।
ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।
কোনো রক্ত নেই, আঘাতের চিহ্ন নেই, আর কাউকে আসতেও দেখা যায়নি। নিঃসন্দেহে এটি বিষক্রিয়ার ফল।
খুনি এখনো শহরের ভেতরে — কিন্তু কেউ জানে না কে... বা কীভাবে সে এটা করল।

ডিটেকটিভ জারা চৌধুরী রাত ১২:৩০-এ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নিচে তার পর্যবেক্ষণ:
১। স্টাডি রুমের দরজা ভিতর থেকে লক করা ছিল। চাবি পারকারের পকেটেই ছিল।
২। পার্কার ছিলেন ডেস্কের উপর ঝুঁকে, মুখ নিস্তেজ কিন্তু কোনো দৃশ্যমান আঘাত ছাড়াই।
৩। পাশে ছিল একটি আধখাওয়া চিজকেকের টুকরো।
৪। হুইস্কির গ্লাস অক্ষত — কেউ ছুঁয়েও দেখেনি।
৫। চিজকেকটি পরীক্ষা করে দেখা গেল এতে কোন বিষ নেই।
৬। জানালা ভিতর থেকে বন্ধ।
৭। ঘরে কোনোরকম লড়াই বা বিশৃঙ্খলার চিহ্ন নেই।

ডিটেকটিভ জারা পুরো সময় হ্যান্ড গ্লাভস পরে তদন্ত চালান। তিনি কোনো কিছু স্পর্শ করেননি, শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করেন।
কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, গ্লাভস খোলার পরই তিনি কিছু লক্ষ্য করেন:
তার হাত থেকে আসছে হালকা বাদামজাতীয় গন্ধ।
ঘর ভিতর থেকে বন্ধ।
কেউ প্রবেশ করেনি।
চিজকেক ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি।
কিন্তু পার্কার মারা গেলেন — এক ফোঁটাও রক্ত ছাড়া।

- **বিষ মিস্টার পার্কারের শরীরে কিভাবে পৌঁছালো?**

সঙ্কটের আহ্বান

সোমবারে সঙ্কট এর এই সংখ্যাটি আশা করছি সবার ভালো লেগেছে। এই সংখ্যাটি আপনার কেমন লেগেছে তা জানাতে ভুলবেন না আমাদের। আপনার রিভিউ, সমালোচনা বা কোন মতামত জানাতে পারেন সোমবারে সঙ্কটের Facebook এ।

সোমবারে সঙ্কটের পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখার বিষয়বস্তু, পাঠানোর নিয়ম ও পাঠানোর শেষ সময় সব পাবেন সোমবারে সঙ্কট Facebook page এর পিন পোস্টে। তাহলে দেরি না করে সঙ্কটের আহ্বানের সাড়া দিয়ে শীঘ্রই পাঠিয়ে দিন আপনার লেখা। এছাড়া আর কোন তথ্য জানার দরকার হলে যোগাযোগ করতে পারেন সোমবারে সঙ্কটের মেসেঞ্জারে বা ই-মেইলে।

ই-মেইল : mondaycrisis0824@gmail.com
ফেসবুক : https://www.facebook.com/mondaycrisis

Scan করুন